বৈষম্যহীন এক নতুন সমাজের প্রত্যাশায়

সানজানা শেখ শাইরী

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'নারী' কবিতায় এই ন্যায্যতা ঘোষিত হয়েছিল বহুদিন আগে। অথচ এ যুগে এসেও আমরা নারীকে কতটা মূল্যায়ন করছি? আমরা অনেকেই হয়ত মনে করি আগেকার যুগ থেকে এখনকার যুগের নারীরা অনেক অগ্রাধিকার পাচ্ছে, এগিয়ে আছে। এই যুগে তারা কত কিছুই না করতে পারছে। কিন্তু বিষয়টা কি আসলেই তাই? এখনো কি নারীরা তাদের পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা পাচ্ছে কিংবা পারছে কি সকল রকম বৈষম্যের ঊর্ধ্বে থেকে নিজের ইচ্ছেমতো কোনোকিছু করতে?

আমরা এখন দেখতে পাই অনেক ক্ষেত্রে নারীদের ওপর শারীরিক নির্যাতন অনেকটাই কমেছে। কিন্তু শুধু শারীরিক আঘাত বা যন্ত্রণা দেওয়াটাই কি নারী নির্যাতন? নিজের ঘরে কিংবা কর্মস্থলে ছোটখাটো কথা বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিত্য নারীর যে অবমাননা করা হচ্ছে সেটা কি কেউ দেখতে পায়? হয়ত অনেক সময় নারী নিজেও বুঝে উঠতে পারে না যে এসব তার প্রতি অমর্যাদাকর বা অবমূল্যায়নকর আচরণ। কিংবা বুঝলেও প্রায়ই তাদের কিছু করার থাকে না। এগুলো হচ্ছে emotional abuse বা মানসিক নির্যাতন। যুগ যুগ ধরেই নারীরা এভাবে অবহেলা ও অবমাননার শিকার হয়ে আসছে।

নারীর প্রতি সম্মান দেওয়াটা আসলে নিজেদের ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। এখনো অনেক ঘরে কন্যাসন্তান হলে অনেকেরই মুখ কালো হয়ে যেতে দেখা যায়। আমরা যদি নিজেদের মনের আঁধার দূর করতে না পারি, তাহলে সমাজের আঁধার কীভাবে দূর করব? পুত্রসন্তান হোক আর কন্যাসন্তান, একজন মায়ের কষ্ট তো একই হয়। সৃষ্টিকর্তাও তো এখানে কোনো বৈষম্য করেন নি। তাহলে সমাজে কেন এত বৈষম্য, এত ভেদাভেদ? সন্তানকে সমান শিক্ষিত করে বড়ো করলেও মেয়ে সন্তানটিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবার বাড়িতে সেই মেয়েটি রাজরানির মতো থাকলেও শ্বশুরবাড়িতে তার সেই সম্মানটুকু থাকে না।

অনেক পরিবারই মনে করে রান্নাবাড়া, ঘর সংসার, সন্তান লালনপালন ও স্বামীর সেবা করাই মেয়েদের প্রধান কর্তব্য। তার নিজের স্বপ্ন, স্বাদ-আহ্লাদ সবই হবে তার নিজ পরিবারকে ঘিরে। তার জীবনটাই যেন উৎসর্গিত হয়ে যায় পরের সুখের জন্য। একটা মেয়ের বিয়ের পরে যেন তার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তার নামটাও যেন হারিয়ে যায় হাজার নামের ভিড়ে। কেউ তাকে ডাকে চাচি, কেউ মামি, কেউ ভাবী, কেউ বৌমা, অথবা মিসেস অমুক। অথচ তার নিজের যে একটা নাম আছে, তার অস্তিত্বটাই দিন দিন হারিয়ে যেতে বসে। এভাবে সে নিজেও তার নামটি প্রায় ভুলে যায়।

মেয়েরা যেন অন্যের আলোকে আলোকিত হয়, কখনো স্বামীর কখনো ছেলের। সে ভুলে যায় তার নিজেরও একটা আলো আছে, যে আলো ছড়িয়ে দিয়ে সে নিজেই সবার আলোর দিশারী হতে পারে। আসলে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। সমাজের রীতি-পদ্ধতি-সংস্কৃতির প্রত্যাশাও সেরকমই।

মেয়েদের জীবনটা যেন একটা মোমবাতি। নিজে জ্বলে জ্বলে অন্যদের আলোকিত করবে। এভাবে একদিন নিজে শেষ হয়ে যাবে। সৃষ্টিকর্তা মেয়েদের অনেক ধৈর্য ও ত্যাগশক্তি দিয়েছেন। কোরানে তিনবার মায়ের কথা বলবার পর একবার বাবার কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা যেখানে মেয়েদের এত সম্মানিত করেছেন, সেখানে পুরুষেরা কেন নারীকে এত অমর্যাদা করবে? কেন তারা মেয়েদের যোগ্য সম্মানটুকু দিতে পারে না?

এমন অনেক পুরুষ আছেন, যারা মেয়েদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। মেয়েরা বাইরে চাকুরি বা ব্যবসা করলে নাকি ধর্মের অবমাননা হবে। আমাদের প্রিয় নবীর স্ত্রী খাদিজা নিজেই ব্যবসা করতেন। সেই যুগে অনেক মেয়েই ব্যবসা করতেন। যেখানে প্রিয় নবী নিজেই তা মেনেছেন, সেখানে কেন এ যুগের পুরুষেরা তা মানতে পারছেন না? নারীর প্রতি সম্মান জানিয়ে তিনি আরো বলেছেন : 'সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন যার চরিত্র সুন্দর, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' (রিয়াদুস সালিহীন ১/১৯৭)।

মেয়েরা পদ্মপাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দু নয় যে একটু টোকা দিলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। মেয়েরা মোমবাতি নয় যে নিজে জ্বলে জ্বলে অন্যকে আলোকিত করে একদিন নিজেই নিভে যাবে। একটা মেয়েরও একটা ছেলের মতো সমানভাবে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটাই এমন। একটা মেয়েকে জন্মের পর থেকেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয় 'তুমি মেয়ে'। তুমি এটা করতে পারবে না, ওটা ধরতে পারবে না। তোমার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে সীমাবদ্ধতা এবং তোমার মূল বৈশিষ্ট্য হলো ধৈর্য ধারণ করে সবকিছু মেনে নেওয়া। ফলে মেয়েদের জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অনেক প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। এসবের মধ্যেই তাকে বড়ো হতে হয়। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একটা ছেলেকে কি আমরা এভাবে বড়ো করি? তাকেও কি শিখতে বলা হয় নিজের ঘর গোছানো, মাকে সাহায্য করা, অতিথিকে আপ্যায়ন করা? শুরু থেকে আমরা অভিভাবকরাই এ ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করি, যা থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে এই ধরনের কাজগুলো কেবল মেয়ে বা নারীদেরই।

আমি বলব মেয়েদের শুধু মেয়ে বা নারী না ভেবে মানুষ ভাবা উচিত। তাহলেই মেয়েদের অধিকার নিয়ে লড়াই করতে হয় না বা এত আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। কারণ মানবাধিকার মানে মেয়েদেরও অধিকার। তারাই আমাদের মা, আমাদের বোন, আমাদের বন্ধু, আমাদের সকল কাজের প্রেরণার উৎস।

শিক্ষাবঞ্চিত বা গ্রামগঞ্জের মেয়েদের অত্যাচার তবু চোখে দেখা যায় বা প্রকাশিত হয়, কিন্তু আধুনিক সমাজের সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়েরা যে নির্যাতিত হচ্ছে না তা নয়, যা অতটা প্রকাশিত হয় না। আর নির্যাতন মানে শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, মানসিক নির্যাতনও হয়। এই শিক্ষিত মেয়েরা প্রায়ই মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারে না, বরং সবকিছু নীরবে হজম করে। অনেক সময় ওরা

বুঝতেও পারে না যে নির্যাতনমুক্ত একটি স্বাধীন জীবন তাদের অধিকারেরই অংশ। অনেক স্বামী বড়াই করে বলেন, 'আমি পড়াশোনা করতে দিয়েছি, চাকরি করতে দিচ্ছি, বাইরে যেতে বাধা দিচ্ছি না, সে সবকিছুই করতে পারছে আমার মত আছে বলে।' এইভাবে ভাববার অধিকার স্বামীদের নেই। এগুলো কি নারীর স্বাভাবিক অধিকার নয়? নাকি এই অধিকার নিয়ে শুধু ছেলেরাই জন্মগ্রহণ করে? স্বামী ইচ্ছা করলে অনুমতি দেবে না হলে দেবে না, এর কোনো বৈধ ক্ষমতা কি তার আছে? স্বামীদের এরকম আচরণ থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়, এখনো আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে কতখানি পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা বিরাজ করছে।

এখনো অনেক পরিবারে অপমানিত আর নির্যাতিত নারীরা দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যায় শুধু সংসারটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। তারা সহ্য করে যায় অনেক অপমান, অনেক অবহেলা, অনেক অবমাননা। সারাদিনের গৃহকর্ম আর সন্তান লালনপালনে বিপর্যস্ত নারীর গৃহশ্রমের মূল্যায়ন পরিবার বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে কখনো করা হয় না। এই সামাজিক ব্যাধির কবলে আমরা সবাই। আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনেরা বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত, কিন্তু তারপরও আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলি না আমাদের সম্মান হারানোর ভয়ে, মাথার ওপরের ছাদটুকু হারানোর ভয়ে।

এমন অনেক পরিবার আছে যারা মেয়ের বিয়ের সময় বলে দেয় শ্বশুরবাড়িটাই তার আসল ঠিকানা। হাজার কষ্ট হলেও সেখানেই তাকে মুখ বুজে থেকে যেতে হবে। যে কারণে ইভানার মতো মেয়েদেরও আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। কারণ তারা ভাবে তাদের কোথাও ঠাঁই নেই।

আমাদের দেশের অগণিত নারী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মজীবনসহ সর্ব ক্ষেত্রেই পুরুষতন্ত্রের শোষণের অবকাঠামোয় আক্রান্ত, কিন্তু জানে না এর থেকে উত্তরণের উপায়। জানে না সঠিকভাবে প্রতিবাদ করার প্রক্রিয়া কিংবা ভাষা। তাই আমার মতে প্রতিটি মেয়েকে স্বশিক্ষিত হয়ে তারপরে বিয়ের পিঁড়িতে বসা উচিত। অন্যের আলোতে নয় বরং প্রত্যেকের নিজের আলোয় আলোকিত হওয়া উচিত। বেগম রোকেয়ার সেই মহান বাণীর সাথে এক হয়ে বলতে চাই, 'ভগ্নীগণ বুক ঠুকিয়া বল আমরাও মানুষ', 'কন্যাগুলিকে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও নিজের ভাত কাপড় নিজে জোগাড় করিবে'।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারীর অধিকার আন্দোলনের সূচনা ৭০-এর দশকে, ৮০ ও ৯০-এর দশকে যা আরো বিকশিত হয়। এর প্রেক্ষাপটে ১৯৯৭ সালে প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণীত ও গৃহীত হয়। ২০০৪-এ নারীনীতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এলেও পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন নারী উন্নয়ন নীতি গৃহীত হয়। এর বাইরে দেশে নারীর অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য প্রচুর আইন প্রণীত রয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন আছে। কিন্তু এখনো নারীর প্রতি অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে এই বৈষম্য দূর করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন যেমন আইনগত বৈষম্য ও ব্যবস্থা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তেমনি দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং বৈষম্যবিরোধী সচেতনতা ক্যাম্পেইন। এই পরিবর্তনগুলো আনবার জন্য রাষ্ট্র, সরকার এবং সকল নাগরিকেরই ভূমিকা রাখতে হবে। সবার অংশগ্রহণ ছাড়া সমাজের সার্বিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সবার আগে নারীদেরই তাদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারা এবং আত্মসম্মানবোধ বজায় রেখে সমাজে চলার মনোবল জারি রাখা। তবেই পরবর্তী প্রজন্ম একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ দেখতে পাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকেই নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার বীজ বপন করতে হবে, যেন ছোট থেকেই তারা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের মানসিকতা নিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তা না হলে পরে আমরা যতই প্রতিবাদ ও আন্দোলন এবং আইন প্রণয়ন করি না কেন প্রকৃত পরিবর্তন কখনোই আসবে না। নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে একদম গোড়া থেকেই পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে, যা কিনা নিজ নিজ পরিবার ও সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব।

নারীর প্রতি আর কোনোরকম অত্যাচার-নির্যাতন নয়, করুণা নয়, অসম্মান নয়। নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান প্রদানই হোক আমাদের লক্ষ্য একটি বৈষম্যহীন সুন্দর নতুন সমাজ গড়ে তুলবার জন্য।

সেদিন সুদূর নয়—
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।

সানজানা শেখ শাইরী সমন্বয়কারী ও উপদেষ্টা, অগ্রগামী শিশু নিকেতন। shairee_gb@msn.com